গোলাম নবী জুয়েল

অনির্ধারিত লক্ষ্য ঃ অস্পষ্ট পথচলা

সেদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সকলকে জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশিকা মিসেস নাজমা কাদের। দীর্ঘদিন নেপথ্যে থাকার পর এখন তিনি নিয়মিত অফিসে বসেন। বিষয়টি হলো কমপিউটার ট্রেনিং সংক্রান্ত। আমরা যখন দেশে কমপিউটারায়নের কথা বলছি তখন কমপিউটার ট্রেনিংয়ের চিত্রটি সকলের নিকট সুস্পষ্ট নয়। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সংকট লক্ষণীয়। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এমন একটি বিষয়ে তথ্য পাওয়ার যে চিত্র, তা হতে পারে এ দেশের সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থার নিয়মিত চিত্র। কিন্তু এটি কাম্য হতে পারে না। তাই এর পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকে অনেকদিন আগে কমপিউটার জগৎ উদ্যোগ নিয়েছিলদেশের দেশের কমপিউটার কেন্দ্রিক একটা চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি ডাটা ব্যাংক গড়ার পরিকল্পনা নেয়। এ লক্ষ্যে পত্রিকায় একাধিকবার বিজ্ঞপ্তিও দেয়া হয়েছিল। ছাপানো হয়েছিল এন্ট্রি ফরম। কমপিউটার জগৎ যে ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে তাতে দেশের সকল কমপিউটার পেশাজীবী, হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যারে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার বিষয়ক লেখক, বই ও প্রকাশক, কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার, কমপিউটার বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য সন্নিবেশিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু তথ্য প্রবাহের গতি বড়ই মন্থর। তথ্য বিনিময়ে অনভ্যস্ত এই জাতির সহজাত গুণটি ঠিকই অর্জন করেছে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরাও। যে কারণে প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে না তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত পত্রিকাটি পর্যন্ত।

অথচ সবাই যদি পরস্পর সহযোগী হতো এবং ডাটা ব্যাংক গড়ে তুলাতে সহযোগিতা করতো তবে মিসেস নাজমা কাদেরের প্রশ্নের জবাব দেয়া ছিল কয়েকটি কী স্ট্রোকের ব্যাপার মাত্র। আর এখন? উফ! ভাবাই যায় না।

কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ, উন্নয়নশীল বিশ্বেরই অংশ ভারত ঠিকই বলতে পারছে তাদের দেশে ৫৬০০ কমপিউটার ট্রেনিং স্কুল বা সেন্টার আছে। শুধু তাই নয় এই সেক্টরে অর্থের যে হাত বদল তাও তাদের জানা। যেমন ঃ ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ট্রেনিং সেন্টারগুলো আয় করেছে ৩০০ কোটি রুপি। যার মধ্যে বৃহত্তম পাঁচটি ট্রেনিং সেন্টার আয় করেছে মোট আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি। এবং এ সময়ে এরা ১৭৫০০০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষিত করেছে।

এমন আরো অনেক তথ্যই ওদের জানা। ওরা তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী। তথ্য বিতরণে উৎসাহী। ফলে তথ্য নির্ভর এই বিশ্বে ভারতীয় তারুণ্যের আসন পাকাপোক্ত হতে চলেছে। তারা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্য মহাসড়কের প্রবক্তা যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতা বলে নেতৃত্বের প্রথম বা দ্বিতীয় সারির জনবলে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের তৃপ্তি নেই। আরো বড় কিছু হতে চায় তারা। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ভারতীয় সরকার ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। তা যেন, ক্রম উন্নতিমুখী তথ্য নির্ভর বিশ্বের জন্য যথেষ্ট নয়–তাই সময় সুযোগ হলেই জানিয়ে দিচ্ছেন সেক্টরটির কর্ণধার বিজ্ঞজনেরা। যে কারণে ভারতীয় আইআইটি-দিল্লীর প্রফেসর এস এন মহেশ বলেন, 'এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে উত্তম কাঁচামাল (শিক্ষার্থী) থাকলেও আপনি মানসম্পন্ন পণ্য (কমপিউটার-বিদ) তৈরী করতে পারবেন না যদি আপনার মেশিনারী (ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী ও প্রশিক্ষক) অপর্যাপ্ত হয়।'

এত্তো এত্তো সুযোগ সুবিধা থাকার পরও তারা মনে করছেন যথেষ্ট নয়। অবশ্য শিক্ষার্থীদের মান সম্পর্কে তাঁদের কোন অসন্তুষ্টতা নেই। প্রফেসর মহেশ ভারতের প্রেক্ষিতে যে কথা বলেছেন ১৯৯৫ সালে ১৯৯১ সাল থেকে সেই কথাটি আরো ব্যাপক ভাবে বিশ্লেষণসহ উদাহরণ দিয়ে বলে আসছে কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের জন্য।

বিশুদ্ধ গণিতের প্রবর্তন যে প্রাচ্যে তারই অংশ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর তরুণেরা এক একজন জ্ঞানের আধার। তাদের মধ্যে আছে অপূর্ব বিশ্লেষণী দক্ষতা, তথ্য প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের লুকায়িত সম্ভাবনা। চাই শুধু দিক নির্দেশনা আর সঠিক পরিবেশ।

দ্রুত ধাবমান সময়ের দাবী সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি। যে পরিবেশে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের যাবতীয় তথ্য জানা সম্ভব হবে।

আমাদের দেশে কমপিউটারকে জনপ্রিয় করার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানটির সেটি হলো বিসিসি। তথ্য সঙ্কটে ভুগছে তারাও। তাদের জানা নেই– দেশে কমপিউটারবিদের সংখ্যা কত? এর মধ্যে প্রোগ্রামার কতজন? ব্যবহারকারী কত? দেশে মোট কতগুলো কমপিউটার আছে? কতগুলো কোন সেক্টরে ব্যবহৃত হচ্ছে? সরকারি কাজকর্মে কতগুলো কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কি কাজে? বেসরকারি খাতে কমপিউটার ব্যবহারের ধরণটিই বা কি? দেশে কতগুলো কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার আছে? সেন্টারগুলো কি শেখাচ্ছে? দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তার ভূমিকা কতটুকু? বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটেই বা তার কার্যকারিতা কেমন? কারা কমপিউটার শিখছে? কেন শিখছে? যে কারণে শিখছে তা বাস্তবে কতটুকু কাজে লাগাতে পারছে? কতগুলো কমপিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে দেশে? তারা কি সঠিক মানের সেবা দিচ্ছে তাদের গ্রাহকদের? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কমপিউটারায়নের স্বার্থেই এসব প্রশ্নের জবাব জানাটা একান্ত প্রয়োজন।

একথা ঠিক যে এ মুহূর্তে আমরা বলতে পারি আমাদের দেশে বেশ কমপিউটারায়ন হচ্ছে। শত শত ভেন্ডর বা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান কমপিউটার ব্যবসায় নিয়োজিত। অপরিকল্পিতভাবে হলেও সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটারের সংখ্যা বাড়ছে। কিছু বড় কাজ কমপিউটারে করার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- ভোটার আইডি কার্ড এবং এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ।

ব্যাংকিং সেক্টরে কমপিউটারের ব্যবহার আগের তুলনায় বেড়েছে। প্রতিরক্ষা, পুলিশ বিভাগ, শুল্ক ব্যবস্থাপনা, ভূমি জরীপসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেক্টরে কমপিউটার পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে। এটি উন্নয়নের সূচনা সঙ্গীত শোনাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এটি যথার্থ উত্তরণ কিনা তা বলা যাবে কমপিউটারের সার্থক ব্যবহার ঘটলে তবেই। বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহার প্রসঙ্গে সবচেয়ে চালু কথাটি হলো এখানে কমপিউটারের শক্তির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না, কম প্রয়োগ হচ্ছে। সব চেয়ে বড় কথা, ক্ষেত্র বিশেষে ভুল প্রয়োগ হচ্ছে।

এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়টি হলো যথোপযুক্ত শিক্ষা। আমাদের দেশে এখন যে কমপিউটার শিক্ষা চালু আছে প্রথমত তা যথেষ্ট নয়। এবং এ প্রসঙ্গে অন্য যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তথ্য প্রযুক্তি তথা কমপিউটার প্রসঙ্গে আমাদের নির্ধারিত কোন লক্ষ্যের কথা জানা যায় না। যে কারণে আমাদের পথ চলাটাও বড় অস্পষ্ট।

আমরা বাংলাদেশে বসে কাজ করলেও বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে সর্বদাই আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। তা না করতে পারলে আমরা সময়ের বিচারে ছিটকে পড়তে বাধ্য হবো। অর্থাৎ গ্লোবাল ভিলেজের আইডিয়াটা মাথায় রাখতে হবে সব সময়। তাই আমরা কমপিউটার শিক্ষাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী করতে কতগুলো বিষয়কে বিবেচনায় আনতে পারি। যেমন ঃ

এক. জাতীয় চাহিদা নিরূপণ;
দুই. আন্তর্জাতিক চাহিদা বিশ্লেষণ;
তিন. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
চার. গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ এবং কর্মযজ্ঞ শুরু করা, ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা যা করছি তা হলো অনেকটা হুজুগে মেতে উঠা। এ থেকে যে লাভ আসে তা সাময়িক। এবং তা থেকে কখনো কখনো ব্যক্তি লাভবান হলেও হতে পারেন। কিন্তু দেশ বা জাতি কোন দীর্ঘমেয়াদী সুফল ভোগ করে না।

ধারণা করতে পারি বাংলাদেশে কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের সংখ্যা হাজারের কোঠায় পৌঁছেছে বেশ আগেই। কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার এখন শুধু রাজধানী ঢাকায় সীমিত নয় সুদূর মফস্বলে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দ্বীপ নগর ভোলা, একদার চন্দ্রদ্বীপ বরিশালে যেমন কমপিউটার পৌঁছেছে তেমনি এর বিস্তার ঘটেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, গাজীপুর, নওগাঁ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, নাটোর, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, খুলনা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইলসহ

অনেক স্থানে। এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামে, কমপিউটারায়নের প্রেক্ষাপট মূল্যায়নে যার অবস্থান ঢাকার পরেই।

মাত্র এক দশকে কমপিউটার ট্রেনিং স্কুল/সেন্টারের এই যে দ্রুত বিকাশ তা শিক্ষার অন্য কোন সেক্টরে অতীতে দেখা যায়নি। আসলে শিক্ষিত মানব সম্পদের চাকরির যে নিশ্চয়তার বানী উচ্চারিত হয়েছে এই সেক্টরে অন্য কোন সেক্টরে কিন্তু তা আগে শোনা যায়নি। যে কারণে এই সেক্টরটির চাহিদা আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দিনে দিনে এই চাহিদা বাড়ছে। অনুমান করি স্বল্প শ্রমশক্তির এই দেশে এই চাহিদা অন্তত আগামী ৫০ বছর বাড়তেই থাকবে।

একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই অপ্রতুল। বরং প্রতি বছরই আমরা একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছি। এ অবস্থায় জাতি হিসেবে আমাদেরকে যদি টিকে থাকতে হয়, অর্থনৈতিক স্বয়ংবরতা অর্জন করতে হয় তবে জনসম্পদকে মানব সম্পদে পরিণত করার কোন বিকল্প নেই। সুষ্ঠ দিক নির্দেশনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকলে মেধা আর মননে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারে বাঙালী– এ বিশ্বাস যে কেউ রাখতে পারে। কিন্তু এই বোধটুকু যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য অতীতে এ দেশ নিয়ে কম ষড়যন্ত্র হয়নি, এখনো হচ্ছে। এর প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কমপিউটারকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সম্ভাবনার সূর্য উকিঝুঁকি দিচ্ছে মেঘের আড়ালে তাকে বের করে আনার দায়িত্বটি গ্রহণ করতে হবে, এবং এটিই সময়ের দাবী।

যা হতে পারে ভবিষ্যতে

ইতিমধ্যে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে মাইক্রো ও মিনি কমপিউটার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। সীমিত পর্যায়ে হলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যোগাযোগেও প্রবেশ ঘটেছে আমাদের। যারা ই–মেইল সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারেনি তারা এটি পেতে উদগ্রীব অর্থাৎ পাওয়ার আকাঙ্খা পোষনের মাধ্যমে এটির প্রতি তাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা নিয়ে বেশ কয়েকটি ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই সেক্টরে শীঘ্রই আরো কয়েকটি ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। উদ্যমী তরুণদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সফটওয়্যার হাউজ দেশের সফটওয়্যার সমস্যা সমাধানে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। এক যুবককে জানি যিনি ঢাকার শ্যালমাটিয়াতে তার অফিসে গত ছয় মাস যাবত একটানা কাজ করছেন সফটওয়্যার ডেভলপমেন্টে। ১০ কিলোমিটার দূরে মিরপুরে বাবা-মাকে দেখতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তার হয় না। এমন তরুণ নিশ্চয়ই আরো আছে এ দেশে।

এদিকে দেশ মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বরণ করেছে। কোরীয়া, জাপানসহ অনেক দেশই এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বাণিজ্য যখন প্রাণ পাবে দেশের এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগে গড়ে উঠবে অনেক বহুজাতিক কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে প্রয়োজন হবে বহু সংখ্যক তথ্য প্রযুক্তি কর্মী। কমপিউটার জানা কর্মীর প্রয়োজন হবে উৎপাদন, বিপণন ও পরিকল্পনায়। দক্ষ ও আধা দক্ষ সেই বিশাল কর্মীবাহিনী যদি বিনিয়োগকারীগণ এদেশেই পেয়ে যান তবে অন্য কোথাও না তাকিয়ে এদের উপরই নিশ্চিন্তে নির্ভর করবেন তা জোর দিয়েই বলা যায়। তাছাড়া ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার তৈরীর ব্যবসা আরো প্রসারিত হবে। ভবিষ্যতে যে বিপুল সম্ভাবনা কমপিউটারকে ঘিরে তার বিপরীতে আমাদের প্রস্তুতি কেমন?

স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

আমাদের দেশে কমপিউটার শিক্ষার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। এগুলো হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিসি, নটামস এবং বিএমডিসির মত মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীটের সংখ্যা কমপিউটার বিজ্ঞান পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর তুলনায় নেহায়েতই অপ্রতুল। ফলে প্রতিবছর হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এখানে পড়ার সুযোগ পায়। বাকীরা কমপিউটার শেখার ইচ্ছা পুরণ করে বেসরকারী ট্রেনিং সেন্টারগুলোত প্রশিক্ষণ লাভের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সমস্যা হলো এ জাতীয় কতিপয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভাল মানের ট্রেনিংয়ে অনেক দক্ষ ও কুশলী কমপিউটার-বিদ তৈরী হলেও শ্রমের বাজারে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। তবে স্বস্তির বিষয় এদের কেউ কেউ ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

কি শেখানো হয় কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে

কমপিউটার ট্রেনিং বলতে মূলত সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ট্রেনিংকেই বোঝানো হয়ে থাকে। যদিও ইদানীং ২/১ টি প্রতিষ্ঠান হার্ডওয়্যারে ডিপ্লোমা দেয়ার দাবীও করছে। তারা যা শেখাচ্ছে তা হলো অ্যাসেম্বল, ডিঅ্যাসেম্বল, ট্রাবল শুটিং, রিপেয়ারিং, মেইনটেইন্যান্স, কমপিউটার প্রিন্টার সার্কিট এনালাইসিস এবং ইউপিএস মেরামত করা।

তবে এই প্রতিবেদনে শুধু মাত্র সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ট্রেনিংয়ের কথাই আলোচনা করা হচ্ছে। আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব সবিশেষ। কমপিউটার সেক্টরে মানব সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমাদের সামনে উন্মোচিত তার একটি হলো ডাটা এন্ট্রি,অন্যটি সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট। আর দুটোরই মূল সুর লুকিয়ে আছে কমপিউটারের সফটওয়্যারে যথাযথ ট্রেনিংয়ের উপর।

কমপিউটার ট্রেনিং প্রসঙ্গে বললে প্রথমেই বলতে হয় অপারেটিং সিস্টেম বা পরিচালন পদ্ধতির কথা। একটা সময় পর্যন্ত আমাদের দেশে শুধু 'ডস' অপারেটিং সিস্টেম শেখানো হতো কারণ বিশ্বজুড়ে বলা চলে এর একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন এমএস ইউন্ডোজ একটি উল্লেখযোগ্য অপারেটিং সিস্টেম। এছাড়া আছে ওএস/২। আরো আছে নভেল এবং ইউনিক্স। শেষোক্ত দুটো নেটওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত হয়। এরপর বলতে হয় সফটওয়্যার প্যাকেজ ট্রেনিংয়ের কথা। এ ধরণের ট্রেনিংয়ে একটি তৈরী করা সফটওয়্যারের ব্যবহার শেখানো হয়। এর দুটো স্তর আছে। প্রাথমিক স্তরে শেখানো হয় এর অন্তর্গত কিছু কমান্ড যার মাধ্যমে এটি চালানো যায়। বেশির ভাগ কমপিউটার সেন্টার এই কাজটিই করছে। পরবর্তী স্তরে ঐ বিশেষ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে নতুন নতুন সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব তা শেখানো হয়। এ পর্যায়ে এসে একজন শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম লেখার দক্ষতা অর্জন করেন। তবে সব সফটওয়্যার প্যাকেজে প্রোগ্রাম লেখা যায় না। কিছু কিছু প্যাকেজ আছে যা শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। যারা প্রোগ্রাম লেখেন তাদেরকে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার চালানোও জানতে হয়। প্রোগ্রাম লিখতে হয় একটি ভাষায়, সেটি হতে হয় কমপিউটারের ভাষা। এটি বেসিক হতে পারে, হতে পারে ক্লিপার, ডিবেজ, ফক্সপ্রো, কোবল, প্যাসকাল, অরকল, সি ++ বা অন্য কোন কিছু।

আমাদের দেশে ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে যে সফটওয়্যার প্যাকেজ শেখানো হয় সেগুলোকে কতগুলো বৃহৎভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ ফক্সপ্রো, ক্লিপার, ডিবেজ ও ফক্সবেজ। উল্লেখিত সবকটি সফটওয়্যার প্যাকেজের একটিই কাজ ডাটা এনালাইসিস। আবার লোটাস, অ্যাক্সেল, কোয়াট্রো প্রো স্প্রেডশীট জাতীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাটার গ্রাফিকাল বিশ্লেষণে হাভার্ড গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয়। অ্যাকুপ্যাক লাগে একাউন্টিংয়ের কাজে। অটোক্যাড সহায়তা করে স্থপতি ও ড্রাফটসম্যানদের। ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের জন্য আছে একাধিক সফটওয়্যার যেমন ওয়ার্ড স্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, এমএস ওয়ার্ড ইত্যাদি।

কোন কোন কমপিউটার সেন্টার একাধিক প্যাকেজ ট্রেনিংকে একত্রিত করে চালু করেছে সার্টিফিকেট কোর্স ও ডিপ্লোমা কোর্স। পাশাপাশি কোন কোন ট্রেনিং সেন্টার বিদেশের ট্রেনিং স্কুলের আঙ্গিকে ট্রেনিং দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

যেহেতু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের নিরিখে কোন সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম প্রণীত হয়নি তাই কমপিউটার ট্রেনিং চলছে সেন্টারগুলোর ইচ্ছে মাফিক। দেশের কমপিউটারায়নের এ পর্যায়ে এসে যার পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

একটি কেস স্টাডি

আব্দুল্লাহ আল আমিন খান চমক ২৭ বছরের তরুণ, কমপিউটারের জগতে পা রেখেছেন ১৯৮৭ সালে। এইচএসএসি পরীক্ষা শেষ। হাতে অফুরান সময়। কিছু একটা করার চিন্তা থেকেই তখন তার কমপিউটার শিখতে যাওয়া। এপলে ডিটিপির কাজ শিখলেন। ডিগ্রীতে ভর্তি হলেন। পড়ালেখার তেমন চাপ নেই। এদিকে ডিটিপি তেমন ভালো লাগছে না। আইবিএম শেখার জন্য একটি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারে গেলেন ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৯ সালে ডিগ্রী পাসের পর চাকরি খুঁজতে গিয়ে পড়লেন বিপাকে। যা শিখেছেন তা ভুলে বসে আছেন। অতএব আবার কোর্স করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলেন। কর্মক্ষেত্রে যেয়ে বুঝলেন যা শিখেছেন তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই অফিস শেষে বাড়ি না ফিরে কোর্স করতে লাগলেন। এটি ছিল ৬ মাসের প্রোগ্রামিং কোর্স। যা আয় করেন তা প্রায় পুরোটাই খরচ করে যা শিখলেন সে প্রসঙ্গে জনাব আব্দুল্লাহ আল আমিন খান চমক বলেন, 'ওখানে কোর্স করে আমার এটুকুই লাভ হয়েছে যে প্রোগ্রামিং করা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। তবে অফিসে এর ব্যবহার ঘটাতে পারিনি। এর কিছু দিন পরেই একটি গ্রুপ অব কোম্পানীতে চাকরির সুযোগ পেয়ে চলে গেলাম। ওখানে গেয়ে বুঝলাম এতদিন ৫/৭ টা প্যাকেজ শেখার জন্য হুড়োতাড়া না করে যদি একটি ভাষা ভালভাবে শিখতাম অনেক উপকার হতো। ব্যাস,

আবার ছুটলাম ট্রেনিং সেন্টারে। ক্লিপার ল্যাঙ্গুয়েজের উপর কোর্স করলাম। কিন্তু মনঃপুত হলো না। অসম্পূর্ণ মনে হলো শিক্ষাকে। এর একটি কারণ হতে পারে যেখানে শিখলাম সেই সেন্টারটির অত্যাধিক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। কোর্স সংশ্লিষ্ট বই পড়ার মতো ওখানে কোন লাইব্রেরীও ছিল না। মনে হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে লাইব্রেরী থাকে না অথচ এটি থাকা প্রয়োজন। কারণ কমপিউটার বিষয়ক বইয়ের অনেক দাম যা সকলের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। আবার কিনতেও হয় অনেক। সে যাক। ভালোভাবে শেখার জন্য কি করা যায় যখন ভাবছি। তখনই পরিচয় হলো একজন ক্লিপার বিশেষজ্ঞের সাথে। অর্থের বিনিময়ে তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে তার বাসায় গিয়ে শিখলাম ক্লিপার, তারপর সি ল্যাঙ্গুয়েজ।'

১৯৯৪ সালে আব্দুল্লাহ আল আমিন নিজেই সফটওয়্যার তৈরীতে মনোযোগী হলেন। এবং ক্লিপার ল্যাঙ্গুয়েজে তার তৈরী করা লাইফ সাইকেল অফ গার্মেন্টস বিজিনেস সফটওয়্যার (যেটি গার্মেন্টস শিল্পের কর্মযজ্ঞের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কাজে সহায়ক) এখন বড় বড় গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যন্ত সফলভাবে।

তিনি মনে করেন, সময় হয়েছে সব প্রোগ্রাম বা প্যাকেজ শেখার চেষ্টা না করে একটি কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ভালভাবে শেখা এবং ইতিমধ্যে যারা কোন পেশায় আছেন তাদের পেশাভিত্তিক ট্রেনিং নেয়া। এভাবেই সফলতা আসতে পারে।

সংশ্লিষ্টদের ভাবনা

ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বোরহান উদ্দীন দেশের বিদ্যমান কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রসঙ্গে বলেন, কমপিউটারে সাক্ষর জ্ঞান বাড়াতে কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে। কমপিউটার বিক্রি বৃদ্ধিতেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। কারণ কমপিউটারের সাক্ষর জনসংখ্যা যত বাড়বে, ব্যবহারকারী যত বাড়বে কমপিউটার বিক্রিও বাড়বে। কমপিউটার সেক্টরের কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যে কারণে আমাদের দেশের বিকাশমান এই সেক্টরটিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এখনি উপযুক্ত সময়। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকসময় কোন কোন ট্রেনিং সেন্টার প্রয়োজনীয় ট্রেনিং সুবিধা দিতে পারে না। যা যৌথভাবে দেয়া যেতে পারে। তার মতে, আমাদের দেশে কমপিউটারে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বাড়লেও বাস্তবে কাজের উপযোগী জনসম্পদ তৈরী হচ্ছে সিদ্ধান্তই ফল। ফলে একটা গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে যা হতে দেয়া ঠিক হবে না।

প্রশিকা কমপিউটার সিস্টেমসের সম্ভাবনাময় তরুন কমপিউটারবিদ জাকারিয়া স্বপন কমপিউটার ট্রেনিং, ট্রেনিং সেন্টার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং এই সেক্টরের গড়ে উঠা মানব সম্পদ প্রসঙ্গে বলেন, কমপিউটার ট্রেনিং নামে যে প্রচলিত শিক্ষা তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সঠিক পথে আগাচ্ছে না। সময়ের দাবী সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ট্রেনিং দেয়া। এটি সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট এবং ডাটা এন্ট্রি উভয় ধরণের কাজের জন্যই প্রয়োজন। ভারতে কোন একটি প্যাকেজ বা ল্যাঙ্গুয়েজে ছয় মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করিয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে সফটওয়্যার তৈরীর কাজে লাগানো হচ্ছে। ফল পাওয়া যাচ্ছে রাতারাতি। কিন্তু বিদেশে সফটওয়্যার তৈরীর হাজার হাজার কাজ থাকলেও আমরা সেগুলো ধরতে পারি না প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রোগ্রামারের অভাবে। দেশে ভাল মানের ৫০ জন প্রোগ্রামার তৈরী হলো না এখন পর্যন্ত। কিন্তু দরকার হাজার হাজার। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট থেকে যারা বের হচ্ছে তারা কেউ বা নাক উঁচিয়ে চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে নতুবা জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থায় উঁচু বেতনে অনেকটা কারনিক কাজ করছে। সৃষ্টিশীল কাজে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অমনি অ্যাক্সিকিউটিভসের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান জনাব মাহমুদুন নবী দেশে কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আলাপকালে কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরলেন এভাবে– দেখা যায় আমাদের দেশে প্রচলিত কমপিউটার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কতগুলো কমান্ড মুখস্থ করানো হয় আর কিছু লেকচার শীট বা নোট দেয়া হয়। যতদিন তারা কোর্স করেন বেশ ভালোই পারেন, কারণ চর্চা থাকে। কোর্স শেষ হলেই যে তারা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। এরপর ২/৪ মাস পরে যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে যান তখন আগে শেখা অনেক কিছুই তারা ভুলে যান চর্চা না থাকার কারণে। আবার কোন মতে ইন্টারভিউ বোর্ড পার হতে পারলেও কাজের ক্ষেত্রে যেয়ে আটকে যান। এ ধরণের সমস্যা মোকাবেলার উপায় প্রসঙ্গে জনাব নবী বলেন, অনেক উপায় আছে। তার একটি হলো সিবিটি বা কমপিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। এ ধরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীকে শেখানো হয় কিভাবে কোন একটি সফটওয়্যার প্যাকেজের কমপিউটার হেল্প মেনু সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায়। এতে করে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কোন সমস্যায় পড়লে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণে ভিডিও এবং অডিও-র ব্যবহার ঘটালে শিক্ষার্থীকে আরো ভালভাবে শেখানো সম্ভব। তিনি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর নিজস্ব লাইব্রেরী থাকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, একটা বড় অঙ্কের প্রশিক্ষণ ফি দেয়ার পর আবার বইয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এস. এম. নুরুজ্জামান দেশের কমপিউটার ট্রেনিং প্রসঙ্গে বলেন, কমপিউটার ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে সরকারের পরিচালনাধীন কোন সংস্থা থেকে সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন থাকা প্রয়োজন। এটি বিসিসি কিংবা কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে হতে পারে। সিলেবাস থাকা প্রয়োজন। এটি সব ধরণের ট্রেনিংয়ের জন্য হতে পারে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বিএমডিসি থেকে স্নাতকোত্তর যে কমপিউটার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তার মান নিয়ে হয়তো বা কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েট প্রশ্ন তুলতেও পারে। কিন্তু একটি ইউনিফর্ম সিলেবাসের আওতায় যদি কমপিউটার ট্রেনিং দেয়া হয় প্রশ্ন তোলার সুযোগ কখনোই থাকবে না। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় শ্রমের বাজারে কমপিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মূল্যায়নের যে সমস্যা তা দূর হবে।

খন্দকার মাজেদ হোসেন কাজ করেন একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়, কমপিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে। ট্রেনিং প্রসঙ্গে বললেন, যারা কমপিউটার বিক্রেতা একটা সময় ছিল তারা কমপিউটার বিক্রির স্বার্থে ক্রেতাকে কমপিউটার সম্পর্কে অনেক কিছু জানানোর চেষ্টা করতেন। এখন তারা ব্যবসাকেই মুখ্য করে দেখছেন। কিন্তু তারা যদি কমপিউটার ক্রেতা ব্যবহারকারীকে সাধারণ ট্রাবল শূটিংসহ ছোটখাটো বিষয়গুলো জানিয়ে দেয় তবে তা নিঃসন্দেহে দেশের কমপিউটারায়নে অবদান রাখবে।

কমপিউটার ভিলেজ এর প্রশিক্ষণ শাখার প্রধান জনাব মোঃ এনামুল হক মনে করেন কমপিউটার সেন্টারগুলোর দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারা দেখেছেন যারা কমপিউটার শিখতে আসে অধিকাংশই ছাত্র, হয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ কিংবা স্কুল পর্যায়ের। যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে আসছে তাদের অনেকের শেকড় গ্রামে। তারা কমপিউটার শিক্ষাকে আকড়ে ধরে রুটি-রুজি করতে চায়। এ অবস্থায় কমপিউটার ভিলেজের অভিজ্ঞতা হলো শিক্ষার্থীদের ডিটিপি শেখানো উত্তম। এতে করে যারা পড়ছে তারা পার্ট টাইম কাজও করতে পারছে। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য কোর্সগুলোর গুরুত্ব যে কম তা কিন্তু নয়। জনাব এনামুল হকের দ্বিতীয় একটি মত ছিল প্রোগ্রামিং তাদের শেখা উচিত যারা লেখাপড়া শেষ করেছে এবং কর্ম উপলক্ষ্যে কোথাও সংশ্লিষ্ট আছে।

দি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কমপিউটার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহেল শরীফ ট্রেনিং সেন্টারগুলোর সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, যখন কোন সংস্থা তার কর্মীদের ট্রেনিং দিতে চায় তখন বেশ সমস্যায় পড়তে হয় প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে। কারণ এত ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের শিক্ষার্থী থাকে যে শেষ পর্যন্ত কেউই তেমন শিখতে পারে না। ট্রেনিংয়ের অন্য এক সমস্যা হলো একজন শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে জ্যাক অফ অল হতে চায়।

অভিযোগের শেষ নেই এবং ভারতীয় অভিজ্ঞতা

আমাদের দেশের কোচিং সেন্টারগুলোর নৈতিকতা বিবর্জিত কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত। একই ছাত্রকে নিয়ে একাধিক কোচিং সেন্টারের টানাটানি আমরা দেখেছি। অনেকটা এ জাতীয় অভিযোগ কিছু কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার সম্পর্কে শোনা যায়। এদের নিকট যেয়ে শিক্ষার্থী যখন জানতে চায় তাদের ওখানে আগে যারা কোর্স করেছে তারা চাকরি পেয়েছে কিনা এবং পেলে কোথায়? অসাধু ঐ কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলো তখন কিছু সংস্থার নাম উল্লেখ করে দাবী করে ওখানকার কর্মীরা তাদের সেন্টারের শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু ঐ কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার কখনো বলে না কতজনকে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ দিতে পেরেছে।

এছাড়া সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষার মান, কোর্স ফিসহ আরো অনেক অভিযোগ কমপিউটার সেন্টারগুলো সম্পর্কে শোনা যায়। এর মিমাংসা হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কোন একটি বিশেষজ্ঞ দল (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বনামখ্যাত কমপিউটারবিদ, কমপিউটার বিষয়ক লেখক, পেশাজীবী ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত) গঠনের মাধ্যমে ওই দলের উপর দায়িত্ব দিতে পারে।

এক্ষেত্রে ভারতের সরকারি উদ্যোগটি প্রনিধানযোগ্য। তারা একজন কমপিউটার শিক্ষার্থীর মান যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে প্রতি বছর দু'বার। এবং মান যাচাই শেষে এদেরকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকে। যারা পরীক্ষায় অংশ নেয় তারা বেসরকারী কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার থেকে

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রশিক্ষণ লাভকারীর পরীক্ষার ফলাফল সে যে ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে সেটির মানেরও প্রকাশক।

তাছাড়া একটি ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনার জন্য কি কি নিয়ম মানতে হবে তারও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন এক. কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের নিজস্ব জায়গা থাকতে হবে ভাড়া বাড়ি হলে কমপক্ষে ১০ বছরের চুক্তি থাকতে হবে।

দুই. নিজেদের পর্যাপ্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার থাকতে হবে।

তিন. প্রতি দু'জন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে একটি কমপিউটার থাকতে হবে।

চার. প্রতি ২৪ জন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে ১৫০ বর্গমিটার আয়তনের ক্লাসরুম থাকতে হবে। প্র্যাকটিক্যালের জন্য ল্যাবরেটরী এবং পড়ার জন্য লাইব্রেরী থাকতে হবে।

পাঁচ. দক্ষ প্রশিক্ষক থাকতে হবে।

ছয়. কোর্স ফি হতে হবে যুক্তিসঙ্গত।

সাত. শিক্ষার আধুনিক উপকরণ অডিও, ভিডিও এবং ওভারহেড প্রোজেক্টর থাকা প্রয়োজন ইত্যাদি।

সরকারের পক্ষে যৌথভাবে ভারতীয় কমপিউটার সোসাইটি এবং ইনষ্টিটিউশন অফ ইলেকটনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ন্যাশনাল সেন্টার ফর সফটওয়্যার টেকনোলজি দেশের সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশে কাজ করে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্র ভারত যেখানে পারছে সেখানে চেষ্টা করলে আমাদের না পারার কোন কারণ নেই।

শিক্ষার্থীরা যা করতে পারেন

আপনি যদি কমপিউটার শিখতে আগ্রহী হন এবং কোন একটি ট্রেনিং সেন্টারে যান তবে অনেকটা বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা আপনাকে ভর্তি করে নিবে। কিন্তু যে সহজ সত্যটি শিক্ষার্থীকে শুরুতেই উপলব্ধি করতে হবে তা হলো গাড়ি চালানো শেখা এবং গাড়ির ডিজাইন করা শেখা ভিন্ন দুটো ব্যাপার। এবং তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কোনটি শিখতে চায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হতো যদি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলো আগ্রহী শিক্ষার্থীকে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের কল্যাণের স্বার্থ চিন্তা করে গাইড করত। সেটি যখন কাঙ্খিত মানে হচ্ছে না তখন আমাদেরকে বিকল্প ভাবতে হবে। বিকল্পটি হলো শিক্ষার্থীর স্বউদ্যোগ। বাজারে অনেক ধরনের ট্রেনিং আছে এর মধ্যে কোনটি তিনি গ্রহণ করবেন তা নির্ভর করে ভবিষ্যতে তিনি নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চান তার উপর। তারপর তার বিবেচনায় আনতে হবে নতুন কিছু শেখার জন্য কি পরিমাণ সময় তার হাতে আছে, কি পরিমাণ অর্থ তিনি ব্যয় করতে পারবেন, এবং তার মেধা বিশেষ করে গণিতে তার আগ্রহ। সর্বশেষ অবস্থাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য যারা প্রোগ্রামিং শিখতে চান তাদের জন্য। আরো কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে যেমন : তিনি যে বিষয়টি শিখতে চাচ্ছেন তার চাহিদা কেমন ? এ ব্যাপারে তাকে জানতে সহায়তা করবে দেশী বিদেশী কমপিউটার বিষয়ক পত্র-পত্রিকা এবং কমপিউটার চাকরি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো।

এবার কিছু কোর্স সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাক–

প্রোগ্রামিং ট্রেনিং ঃ প্রোগ্রামিং ট্রেনিংকে আবার দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। একটি হলো অ্যাডভান্সড লেভেল বা অগ্রবর্তী পর্যায়ের অন্যটি প্রাথমিক পর্যায়ের। ভারতে অগ্রবর্তী পর্যায়ের ট্রেনিংগুলো হয় দেড় বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত। এমনকি চার বছরও। এমন ট্রেনিংগুলোতে তিন মাস থেকে এক বছরের ইন্টার্নীশীপ থাকে প্রফেশনাল প্রাকটিসের জন্য। এ সময় শিক্ষার্থী কোন এক সংস্থার সঙ্গে ফুল টাইম কর্মী হিসেবে যুক্ত থাকেন। আর এন্ট্রি লেভেল বা প্রাথমিক পর্যায়ের ট্রেনিং-এর সময়কাল হয়ে থাকে ছয় মাস থেকে এক বছর।

প্রোগ্রামিং ট্রেনিংগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে একজন শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম লেখার কৌশলগুলো বুঝতে পারেন কিংবা রপ্ত করতে পারেন। আমাদের দেশে প্রোগ্রামিং ট্রেনিং দেয়া হয় ছয় মাস থেকে ১ বছরের কোর্সে। এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখুন।

করপোরেট ট্রেনিং ঃ যারা ইতিমধ্যে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের পেশা কেন্দ্রিক যে কমপিউটার ট্রেনিং তাকে করপোরেট ট্রেনিং বলা হচ্ছে।

মালটিমিডিয়া / এনিমেশন ঃ মালটিমিডিয়া ও এনিমেশনের কাজ এখন বেশ জনপ্রিয়। তবে আমাদের দেশে এ বিষয়ের উপর ভাল কোন ট্রেনিং ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি।

নেটওয়ার্কিং ঃ আমাদের দেশের বড় বড় কোম্পানীগুলোতে নেটওয়ার্কিংয়ের চাহিদা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। দেশে নোভেল ও ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম নেটওয়ার্কিং-এ ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা কমপিউটারের বেসিক ধারণাগুলো রপ্ত করতে পেরেছেন তারা নেটওয়ার্কিং ট্রেনিং নিতে পারেন।

ডিটিপি ঃ ডিটিপি বা ডেস্কটপ পাবলিশিং অনেকে গুরুত্ব দিতে চান না। আবার কেউ কেউ কমপিউটারের কাজ বলতে এটুকুই বোঝেন। দু'দলেরই ধারণা ঠিক নয়। সত্যটি হলো ডিটিপির কাজ আমাদের দেশে আগে ছিল, এখনো আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ডাটা এন্ট্রির কাজ বাড়লে এর চাহিদা আরো বাড়বে। অতএব এটি শেখা যেতেই পারে।

কিন্তু যে ট্রেনিং শিক্ষার্থী নিতে চান সেটি কোথায় নিবেন সেটি নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার। নিজে কমপিউটার কিনে শিখতে পারলে এর চেয়ে উত্তম আর অন্য কিছু হতে পারে না। কিন্তু অনেকের পক্ষেই সেটি সম্ভব নয়। তাই যাচাই বাছাই করে ট্রেনিং সেন্টার নির্ধারণ করতে হবে।

সবশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো অনেক কিছু না শিখে কোন একটি বিষয় ভালভাবে শেখার চেষ্টা করা। একথা আগেও সত্য ছিল এখনও সত্য যে, বিষয় যেটিই হোক না কেন তাতে দক্ষ হতে পারলে তার মূল্যায়ন হবেই।

একটি চিঠি কিছু কথা

এই লেখার কাজ যখন চলছে তখন অনেকটা কাকতালীয়ভাবে বিষয় সংশ্লিষ্ট একটি চিঠি পেলাম কমপিউটার পরিবারের সদস্য একজন নিয়মিত পাঠকের নিকট থেকে। ঢাকার পশ্চিম রামপুরা থেকে পাঠক মোঃ তাইফুর লিখেছেন '...... ১৯৯২ সাল থেকে আমি নিয়মিত কমপিউটার জগৎ খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এমনকি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। .... এইচ.এস.সি. পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী কমপিউটার বিষয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী। কিন্তু কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় তারা ব্যর্থ হয় যেমন আমি হয়েছি। কমপিউটার জগৎ এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুক। তাই নভেম্বর সংখ্যা চাই এ বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ফিচার সম্বলিত।'

এমন চাওয়া বোধ হয় শুধুমাত্র মোঃ তাইফুরের নয়, আরো অনেকের। তাদের জিজ্ঞাসা মিটানোর একটা চেষ্টা আমরা এখানে করেছি। একই চিঠিতে পত্র লেখক বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গেও লিখেছেন। আসলে বিজ্ঞাপন যে শিক্ষার অনুসঙ্গ হতে পারে সে বিষয়টি পুর্নবার প্রমাণ করেছে তথ্য প্রযুক্তির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন শুধু পণ্যের প্রচারই করে না পাশাপাশি এটি ঐ নির্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে পাঠককে ধারণা দেয়। এভাবে পৃথিবীর বহুল প্রচারিত কমপিউটার পত্রিকা (বাইট, পিসি ম্যাগাজিন প্রভৃতি)র মতো এদেশের কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকরাও নতুন নতুন পণ্য ও আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

শেষ কথা

দেশে সুষ্ঠু কমপিউটারায়নে উন্নত ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে সম্মিলিত উদ্যোগ যত তাড়াতাড়ি নেয়া যায় ততই মঙ্গল। উন্নত ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রতিটি ট্রেনিং সেন্টারকে যে শর্তগুলো পূরণ করতে হবে যে সম্পর্কে একটা ধারণা পূর্বেই দেয়া হয়েছে। তবে আবারো বলছি প্রতিটি ট্রেনিং সেন্টারের উন্নত ল্যাবরেটরী, দক্ষ প্রশিক্ষক এবং লাইব্রেরী থাকাটা অপরিহার্য। কেন সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিদেশে কমপিউটার ট্রেনিং (তাও আবার লোটাস, ডিবেস, ওয়ার্ড পারফেক্টের মতো কোর্স) নিতে যাচ্ছেন ? তা কি শুধুই প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করার জন্য? নাকি আমাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলোর ব্যর্থতা? বেসরকারি পর্যায়ে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবেশী দেশ ভারত কিংবা সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে সেটি কেন? এসব তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কমপিউটার শিক্ষার অভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। এর দায়ভাগ কে নিবে তাও নির্ধারণ করা যেতে পারে?

তবে সর্বোপরি যেটি করতে হবে তা হলো আগামী শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে একটি সুশিক্ষিত কমপিউটার জাতি গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে এই লেখায় কমপিউটার ট্রেনিংয়ের মত ব্যাপক বিষয়ে পুরোপুরি ধারণা দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিষয়টির আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। এটিকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সবাইকে তৎপর হতে হবে, বিশেষ করে কমপিউটারবিদদের যারা দেশ ও সমাজের মঙ্গল নিয়ে ভাবেন। ❑

কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য

বিশেষ সুযোগ!

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এখন থেকে একজন দু' বছরের জন্য অথবা দু'জন একত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায়, প্রত্যেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হলে মাত্র ৩০০/= (তিনশত) টাকা ক্যাশ/পে-অর্ডার/মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঠালেই চলবে। ঢাকা শহরের গ্রাহক ব্যতীত চেক গ্রহণযোগ্য হয়। এছাড়া ৬ মাসের জন্য গ্রাহক ফী ১১০/= (একশত দশ) টাকা এবং এক বছরের জন্য ২০০/= (দুইশত) টাকা মাত্র। গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে হবে 'কমপিউটার জগৎ'-এই নামে।

ঠিকানা ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।